শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(ষষ্ঠ কিস্তি)

ফাহিম ফিরোজ ভাইয়ের রুমে ঢুকে দেখল স্বপনদা বসা। সাদা পাজামার ওপর একটি প্রিন্ট শার্ট। কোন টুপি নেই মাথায়। পকেটে আছে হয়তো। স্বপনদাকে আদাব দিয়ে ফাহিম জিজ্ঞাস করল, ভাইয়া ডেকেছ ?

-বস এখানে।

-তোমাদের ধন্যবাদ। ডাক্তার ডেকে ঠাকুর মাকে তোমরা চিকিৎসা করিয়েছ এ জন্য । হাসিমুখে স্বপন বলল।

এবার ফিরোজ বলল, আচ্ছা ফাহিম, মহল্লায় এমন কি কোন জায়গা আছে যেখানে মানুষ যায় না।

-কেন?

-স্বপনরা কিছু একটা জিনিষ লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। যেটা যখন তখন বহন করা যায় না। আছে এমন কোন জায়গা ?

: আছে। ফাহিম জানালো। মিল্টনদের বাসার পিছনের বাগানে রাখা যায়। সেখানে সহজে কেউ যায় না। নতুন কেউ ওখানে যাবে না। আমরা যারা অভ্যস্ত, তারাই শুধু যেতে পারে। ওখানে এখন তিন দিকে খাল । আর একদিকে উঁচু বেড়া ।

-খালের উপর গাছ দেওয়া আছে না ? স্বপন জিজ্ঞাস করল।

-আমরা গাছ গুলো পানিতে ফেলে দিয়েছি। আচ্ছা স্বপনদা , কি রাখবেন ওখানে?

-বলতে নিষেধ আছে। কিছু মনে করো না।

-ঠিক আছে। তবে আমি কিন্তু কিছু অনুমান করছি।

-যা ইচ্ছা কর। আমাকে জিজ্ঞাস করো না।

ফাহিম স্বপনকে নিয়ে গেল বাগানে। স্বপনকে খুব সন্তুষ্ট দেখাল, যদিও মুখে কিছু বলল না।

-চলবে এখানে। ফাহিম জানতে চাইল।

-তোমাকে তো বলা যাবে না। কি চিন্তা করে আবার বলল, শোন এই বাগানে আমরা কিছু অস্ত্র রাখবো। কোথায় রাখবো তা আবার জিজ্ঞাস করো না। বোঝো তো, অস্ত্র নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়া সহজ না। আরেকটা কথা । তোমাকে যা বললাম কারো সাথে শেয়ার করো না।

-ও। তার মানে আপনি মুক্তিযোদ্ধা। এই কারণেই আপনি মাথায় টুপি দিয়ে মুসলমান সেজে হেঁটে বেড়ান। যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

-স্বপন হাসে। কিছু বলে না। ওরা বাগান থেকে বের হয়ে আসে।

ফাহিম খেয়াল করলো একটা কুকুর ইদানীং ওদের বাসায় সামনে বসে থাকে। দিনে এদিক-ওদিক যায়, তবে রাতে ঘরের সামনে এসে ঠিকই বসে থাকে। কামালের মনে হয় কুকুরটা যে বাসায় থাকত তারা গ্রামে চলে গেছে। অথবা অন্য জায়গায় । তাই দিনে ওই বাসায় যায় ঠিকই। রাতে ক্ষুধায় এদিকে চলে আসে।

ফাহিমের বোন মর্জিনার কাজ একটু বেড়ে গেছে। সকালে স্কুলে যাবার আগে খাবার দেয় কুকুরটাকে । আবার স্কুল থেকে ফিরেও খাবার দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে সবাই কুকুরটাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। এক সকালে স্কুলে যেতে যেতে মর্জিনা আবিষ্কার করে, কুকুরটি তার পিছন পিছন আসছে। বাসা থেকে মর্জিনার স্কুল এক মাইল হবে না তবে আধা মাইলের বেশি হবে । কুকুরটা পুরো পথ মর্জিনার পিছন পিছন স্কুল পর্যন্ত গেল।

স্কুল থেকে ফিরে মর্জিনা ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায় । কুকুরটাকে খোঁজে। পাতা বাহার গাছের আড়াল থেকে কুকুরটা বের হয়ে আসে।মর্জিনার দিকে তাকিয়ে ডাকে ঘেউ ঘেউ ঘেউ। মর্জিনা কুকুরটা নাম দেয় টম।

মজিদ সাহেবের কুকুর খুব অপছন্দ। তবে এই কুকুরের কাণ্ড কারখানা শুনে তার অপছন্দের মাত্রাও কমতে থাকে। টমকে দেখে দেখে মজিদ সাহেবের মাথায় একটি প্রশ্ন তৈরি হয়। এরকম উপকারী একটি প্রাণীকে তাঁর ধর্মে কেন এত অসম্মানের চোখে দেখা হয়।

স্কুল থেকে বের হয়ে মর্জিনা একদিন দেখে দুটো মিলিটারি গাড়ি রাস্তার উপর দাড়িয়ে। তাকিয়ে দেখল মিলিটারিরা গাড়ি থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে। মর্জিনার ভয় করতে লাগলো, ভীষণ ভয়। বুকের মধ্যে ধরপড়ানী ক্রমেই বাড়তে থাকে। মর্জিনা এগুতে এগুতে আরও কিছু দূর যেতেই দেখে, টম দাড়িয়ে ।

মর্জনাকে দেখে টম শব্দ করে ডাকে, ঘেউ ঘেউ। অনবরত নাড়তে থাকতে তার লেজ। একটা কুকুরও যে আপন জনের মত হতে পারে মর্জিনা এই প্রথম জানাল। ওর চোখে পানি এসে গেল। সে টমের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল । ওর পিছন পিছন টম আসতে থাকলো।

তনুর ঘটনার পর মহল্লায় বহু দিন অবাঙ্গালী সেই ছেলেগুলোকে দেখা যায়নি। কিন্তু গতকাল থেকে আবার আসতে শুরু করেছে। ওরা রাজাকারদের সাথে কথা বলে , আড্ডা মারে। ছোট স্বরে নানা আলাপ করে । গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যায়। বেপরোয়া একটি ভাব চলে এসেছে ওদের মধ্যে। ফাহিমদের ভাল লাগে না।

এক সন্ধ্যায় বি এম স্কুলের মাঠ থেকে ফাহিমরা ফিরছিল। সুধীর উকিল বাবুর বাসার পিছন হয়ে । এই পথটায় এমনিতে মানুষ-জন কম চলাচল করে। ওরা দেখে কয়েকটা ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে ওদের গলি থেকে এদিকে আসছে। হয়ত মাঠের দিকে যাবে।

ফাহিম কামাল ভাইয়ের রুমে স্বাধীন বাংলা শুনছিল। চরমপত্র চলছিল তখন। চরমপত্র তখন কেউ মিস করতে চায় না । শুনলেই একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় মনে । মনে হয় বাঙ্গালীরা আসলেই বসে নেই। তারাও যুদ্ধ করছে। দেশ একদিন ঠিকই স্বাধীন হবে। হঠাৎ ডুম ডুম করে দূরে ও কাছে অনেকগুলো বোমা ফাটল । কয়েকটা ফাটল খুব কাছে । কানে তালা লাগার মত অবস্থা।

ফিরোজ বলল, মনে হয় রাজাকারদের বাসার সামনে বোমা ফাটানো হয়েছ। ওরা তো এখন পাগলা কুত্তা হয়ে উঠবে।

-কি করবে ওরা ?

-ভাবছি। রাজাকাররা ভাবতে পারে, যারা বোমা ফাটাচ্ছে তারা থাকে আশপাশে । সেই চিন্তা থেকে ওরা ঘরে ঘরে সার্চও শুরু করতে পারে ।

-তা ঠিক। আমাদের কিছু করার কি আছে, ভাইয়া ?

-ভেবে দেখি।

পরের দিন সকালে বাবা-মাকে বলে ফিরোজ মুসলিম গোরস্তানে তার এক বন্ধুর বাসায় চলে গেল। দুইদিন থাকবে সেখানে। কামালের ধারনা, আজ অথবা কাল রাজাকাররা বাসায় আসতে পারে । দেখতে, সন্দেহ জনক কিছু পাওয়া যায় কিনা।

বাদল অক্সফোর্ড মিশন স্কুলে পড়ে। যাবার সময় দেখল সুধীর বাবুর বাসায় রাজাকার ক্যাম্পের সামনে বড় বড় বেশ কয়েকটা দাগ। বোমা ফাটার দাগ। রাত নয়টার দিকে ফাহিমদের বাসার কড়া নেড়ে উঠল । মজিদ সাহেব দরজা খুললেন। দেখলেন, খাকি পোশাকের কয়েকজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এদের একজনকে চেনা গেল। লক্ষণ কাকাদের বাসার রাজাকারদের ক'জন।

-কি ব্যাপার?

-চাচা, আমরা আপনার বাসাটার ভিতর একটু দেখবো।

-কেন ?

-দেখুন গতকাল ক্যাম্পের সামনে অনেকগুলো বোমা ফাটানো হয়েছে। তার মানে কেউ আশে পাশে থেকে এটা করতে পারে। আমরা এলাকার প্রতিটি বাসা এজন্য সার্চ করছি।

-ঠিক আছে , আসেন ভিতরে।

-মোট ছয় জন ঘরের ভিতরে ঢুকল। দুই জন বাইরেও থাকলো। ঘরের প্রতিটি রুমে গেল ওরা। কামালের রুমে এসে জিজ্ঞেস করল, এ রুমে কে থাকে ?

-আমার ছেলে। ও গত সপ্তাহে ঝালকাঠি গেছে। চাল আনতে।

-গত সপ্তাহে?

-জি।

-ঠিক আছে মজিদ সাহেব। দরজাটা তাহলে দিয়েই রাখুন ।

মর্জিনা খেয়াল করলো, একটি রাজাকার আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরের দিন শোনা গেল , বাদলদের বাসাতেও লোকগুলো গিয়েছিল। সেখানে ওরা সোনাই নাহাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু নেয়ার সময় কীভাবে যেন সে পালিয়েছে।

স্কুল থেকে বের হলে সামনে সার্কিট হাউজ। ফেব্রুয়ারির মাসে ফাহিম এখানকার দেয়ালে দেখেছে বেশ কয়েকটা স্লোগান । একটা হল, ‘ তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা’। একই জায়গায় তিন মাস পরে দেখছে, ‘ইয়াহিয়ার দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান’। আজ বাসার সামনের একটা দেয়ালে দেখা গেল নতুন একটা স্লোগান, ‘বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো’।

এই শহরের শুধু মানুষ না, দেয়ালগুলোও বলে দিচ্ছে, সময়টা কেমন যাচ্ছে। ফাহিম মজার একটি ব্যাপার লক্ষ্য করছে, দেয়ালগুলো, দেয়ালের লেখাগুলো, রাতের অন্ধকারে বদলে যাচ্ছে। তার মানে, রাত জেগে এগুলো লেখা হয় । রাত জেগে মানুষ কাজ করছে। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য।

বিএম স্কুলের মাঠে খেলা শেষ করে ফিরছিল মিল্টনরা। হঠাৎ একটি আর্ত চিৎকার ওদের কানে ভেসে আসলো। ওরা কান খাড়া করলো। শব্দটা আসছে সুধীর উকিলের বাসার রাজাকার ক্যাম্প থেকে। আরও কিছু চিৎকার শুনল ওরা, সাথে কান্নার শব্দও।

-না, না। আমি কিছু জানি না। উহ, আহ...। একটি লোকের কথা শুনতে পেল ওরা। আবার চিৎকার। কান্নার শব্দ...।

মিল্টন বলল, রাজাকাররা টর্চার করছে। টর্চার করে কথা বের করতে চাচ্ছে মনে হয়। বাদল বলল, চল। ভাল লাগছে না। ওরা চলে গেল যে যার বাসায়।

আগস্ট মাসের এক সকালে মনা এসে ফাহিমকে বলল, বি এম স্কুলের মাঠে একটা ডেড বডি পরে আছে। ওরা মাঠে চলে গেল সবাই। মাঠে নয়, মাঠের পাশের রাস্তায় পড়ে আছে ডেড বডি। দু'জন ছোট স্বরে বলল, লোকটি রাজাকার। বাড়ি থেকে ফিরছিল। প্রতি সপ্তাহে এই রাস্তা দিয়ে বাড়ি থেকে ফিরত। নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধারা এখানে ওঁত পেতে ছিল।

কিছুক্ষণ পর দুইটা গাড়ি আসলো। একটা গাড়িতে ছয়-সাতজন রাজাকার। গাড়ি দেখে লোকজন সরে গেল। মৃতদেহটি গাড়িতে নিয়ে ওরা চলে গেল।

ফিরোজের রুমটা বাড়ির পাশের দিকে। স্বপন মাঝে মাঝে এসে টোকা দেয় তার রুমে। কোন না কোন কাজে সাহায্য নেয়।

ফিরোজ ও ফাহিম বেতারে খবর শুনছিল। এসময় টিনের বেড়ায় টোকার শব্দ হল। ফিরোজ জিজ্ঞেস করলো, কে ?

-ভাইয়া দরজা খোলেন। আমি।

-ফিরোজ দরজা খুলে দিল। রুমে প্রবেশ করলো স্বপন। ভাইয়া, একটি কাজ করতে হবে।

-কি?

-একটি চিঠি লিখবেন। চিঠিটি কাফনের কাপড়ের সাথে পাঠাবো। চিঠির ভাষা যেমনই হোক, তাতে লেখা থাকবে, তোদের জন্য কাফনের কাপড় পাঠালাম। মৃত্যু সন্নিকটে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক। অথবা এই জাতীয়। চিঠিটা আমরা পাঠাবো পিচ কমিটির মেম্বারদের কাছে। পঁচিশটি চিঠি লিখে রাখবেন। ওদের মরার ভয় দেখাতে হবে। সাহসটা ডাউন করতে হবে।

-ঠিক আছে। কাল আসিস। পেয়ে যাবি।

আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল স্বপন।

৭

মিল্টনদের বাসার পশ্চিম পাশে খলিফা চাচার বাসা। স্কুলে আসা-যাওয়ার সময় ওই বাসার পাশের ছোট রাস্তাটা ব্যবহার করে মিল্টন। আজ নিয়ে তিন দিন হল, ও শুনছে ওই বাসা থেকে কান্নার মতো একটা শব্দ আসে। চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণ। একটি মেয়ের গলা। মেয়েটির বয়স কমই হবে।

মিল্টন এগিয়ে গেল কান্নার শব্দ বরাবর। দেখতে হবে কি হচ্ছে। চাচার বাসার এই দিককার দুইটা রুম ভাড়া দেওয়া। এর একটি রুম থেকেই আসছে কান্নার শব্দ। কিন্তু দরজা বন্ধ। কি করবে মিল্টন। নক করা কি ঠিক হবে ? হঠাৎ রাস্তায় চাচাকে দেখা গেল।

-চাচা, এই বাসায় কে কাঁদে ?

-শিকদার সাহেবের স্ত্রী। উনারা আমার ভাড়াটে।

-কি হয়েছে উনার।

-উনার স্বামী আজ থেকে দশ দিন আগে ঢাকায় গিয়েছে অফিসের কাজে। ফেরার কথা পাঁচদিন আগে। এখনও ফেরেনি।

-উনি কি অফিসে খোঁজ নিয়েছেন ? মানে অফিসের লোকেরা হয়তো ভাল ভাবে কিছু একটা বলতে পারবে। কোন সমস্যা হয়েছি কি না?

-হ্যাঁ, উনি দু'বার অফিসে গিয়েছিলেন। উনারা কিছু বলতে পারেনি।

-উনার আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে ?

-না। বুঝেছ মিল্টন, আসলে সবাই এখন নিজেরে নিয়েই ব্যস্ত। অন্যের খোঁজ নেবার মানুষও কমে যাচ্ছে।

ফাহিম ও বাদলকে বলল মিল্টন প্রতিবেশী মহিলার কথা। কিছু একটা করতে হবে। কি করা যায় ? ভাবছে ওরা।

এক বিকেলে কড়া নাড়ল মিল্টন দরজায়। সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা। শাড়ি পড়া অল্প বয়সী একজন মহিলা। শাড়ির রঙটা গাঢ় সবুজ, গায়ের রং ফরসা। শরীরের মাঝখানটা বেশ ভারি। মনে হয় বাচ্চা হবে।

-কি ব্যাপার খোকা ?

-পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস পানি দিবেন ?

-আসো, ভিতরে আসো।

উনি পুরো দরজাটা খুলে দিলেন। একটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। মিল্টন চেয়ারে বসলো। দুই রুমের বাসা। এই রুমটা বসার ঘর। রুমের দেয়ালে অনেকগুলো ছবি টানানো। একটি ছবি বিয়ের। বধূ ও বরের ছবি। ছবির বউটি এই মেয়েটিই।

পানির সঙ্গে দুটো বিস্কুট পিরিচে নিয়ে ঢুকল মেয়েটি। তোমার নাম কি ?

-মিল্টন।

-কোন ক্লাসে পড়ো ?

-ফাইভে।

-কোন স্কুলে?

-বি এম স্কুলে।

-তোমাদের বাসা কোথায়?

মিথ্যা বলতে পারলো না মিল্টন। হাত উঁচিয়ে দেখাল নিজেদের বাসা।

-তোমাদের বাসা তো কাছেই। তুমি তো বাসায় গিয়েই পানি খেতে পারতে।

মিল্টন এ কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমি যখন এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এ বাসা থেকে কান্নার শব্দ শুনি। তাই খোঁজ নিতে এলাম, কে কাঁদে। তাই দরজার কড়া নাড়লাম। আমি কি অন্যায় করে ফেলেছি ?

-না, খোঁজ নেবার জন্য বরং ধন্যবাদ। আমার নাম সাবিহা। আমাকে তুমি সাবিহা আপা বলে ডাকবে। কেমন ?

-আচ্ছা। আচ্ছা আপা, দুলাভাই নাকি ঢাকায় গিয়ে আর ফেরেনি ?

-হ্যাঁ। খোঁজ পাচ্ছিনা কোনও।

-বাড়িতে কি খোঁজ নিয়েছেন ?

-চিঠি লিখেছি। পোস্ট করা হয়নি অবশ্য। তুমি কি আমার চিঠিটা পোস্ট করে দিতে পারবে?

-কই, দেন চিঠিটা।

সাবিহার কাছ থেকে চিঠি নিলো মিল্টন। দিনাজপুরের ঠিকানা। স্কুলের সামনের পোষ্ট বক্সে ফেলে দিল চিঠিটা। ফিরে এসে দেখল, ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে কান্নার শব্দ । সাবিহা আপা কাঁদছে। দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েও নাড়ল না। দুঃখের সময় কাঁদতে হয়। কান্না হল দুঃখ লাঘবের অস্ত্র ।

বাদলের বড় ভাই উদ্ভ্রন্তের মতো তাকাচ্ছে সবার দিকে।

-কি রে, কি হয়েছে বল। জিজ্ঞেস করলেন হাবিব কাকা তাঁর বড় ছেলে বাবুলের কাছে।

-আব্বু, মতি চাচা মারা গেছে।

-কখন, কিভাবে? জানতে চাইলো বাদল। দেখল, বাবা বিছানার উপর বসে পড়েছে। কিছু বলতে পারছে না। যেন বিশ্বাস করতেই পারছেন না। তাই ছেলেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

-কি হয়েছে মতির?

বাবুল ভাই বিস্তারিত বললেন এরপর। স্বরূপ কাঠির একটি রাজাকার ক্যাম্পের ঘটনা। কমান্ডার মতিউর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ঘিরে ফেলেছে একটি রাজাকার ক্যাম্প। রাজাকারদের বলা হল আত্মসমর্পণ করতে। রাজাকাররা বলল, একজনকে পাঠাতে। যার সঙ্গে আলাপ করে আত্মসমর্পণ করবে। কমান্ডার মতি এগিয়ে গেলেন। যেই ক্যাম্পের কাছে গেলেন, শুরু হল গোলাগুলি।

উভয়পক্ষের গোলাগুলি থামল এক সময়। ততক্ষণে কিছু রাজাকার পালিয়েছে। ক্যাম্প দখলের পর দেখা গেল বেশ কয়েকটি মৃতদেহ। কমান্ডার মতিউরের নিথর দেহ পড়ে আছে ক্যাম্পের দরজায়। এছাড়া অধিকাংশই রাজাকারের লাশ।

বাদলের বাবা হাবিবুর রহমান ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করলেন না। পরদিন চলে গেলেন স্বরূপকাঠি। ফিরলেন তিনদিন পর। মুমুর্ষ নিজের পিতাকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। ছোট ভাইয়ের মৃত্যু শোক কিছুটা চাপা পড়লো নিজের বাবার অসুস্থতায়।

বাদল বাবার মুখে গ্রাম বাংলার বাস্তব অবস্থা শুনে হতাশ হয়ে পড়লো। মিলিটারি-রাজাকাররা দেদারছে মানুষ মারছে। পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারছে। শিকার উৎসব যেন এক । চোখে-মুখে কি যে আনন্দ এই মানব-পশুদের।

রাজাকাররা মিলিটারিদের বাড়ি চিনিয়ে দিচ্ছে। ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুবকদের। নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে করছে ব্রাশ ফায়ার।

এক রাতে ফিরোজের রুমে মৃদু নকের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে দেখে সোনাই নাহা কাকা দাঁড়িয়ে। ফিরোজ দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলো। গা গরম। বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল তাড়াতাড়ি।

-কোথায় ছিলেন এই দু'দিন ?

-বাগানে। লক্ষণদের পশ্চিম পাশের বাগানে।

-জ্বর কবে থেকে ?

-আইজকা, সকাল থাইক্কা। মনু, চারডা ভাত দিবা ? কিছুই খাইনাই এই কয়দিন। বলে কাঁদতে শুরু করলেন উনি।

ফাহিমের মা ফাতেমা বেগম নিজ হাতে ভাত বেড়ে দিলেন। সামনে ভাত পেয়ে আরও হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন সোনাই নাহা। বললেন, কন্ ভাবি, এত কিছুর মধ্যেও ভাত খাইতে ইচ্ছা করতাছে। নিজের উপর ঘিন্না লাগতাছে। এর চাইতে মইরা যাওয়া ভাল। ভগবান কেন যে নেয় না!

খাওয়া শেষ করলেন সোনাই কাকা। যত না ভাত খেলেন, তার চেয়ে বেশি খেলেন পানি। খাওয়া শেষ করে খুকখুক করে কাশতে লাগলেন।

ফাহিম দেখল, সারা শরীরে লাল লাল বিচির মতো দাগ। মশার কামড় মনে হয়। ফাহিম প্যারাসিটামল আর হিস্টাসিন এনে দিল। খেয়ে ঘুমালেন সোনাই নাহা। তিন দিনের জমানো ঘুম।

১৪ আগস্ট ১৯৭১

টিচাররা খুব করে বলে দিয়েছেন, আমরা যেন খুব সকালে স্কুলে আসি। সেখান থেকে স্টেডিয়ামে যেতে হবে। স্কুলের পক্ষে কিছু একটা অংশগ্রহণ আছে। ছাত্রদের দর্শকের গ্যালারীতে থাকতে হবে। ফাহিম ওদিকে গেলনা, গেল স্টিমার ঘাটে। কীর্তন খোলা নদীতে নৌকা বাইচ হবে।

পরিকল্পনা মত বাদল ও মিল্টন গেল কীর্তন খোলার পাড়ে। তিন বন্ধু মিলে দাঁড়ালো একটি জেটির পাশে। হঠাৎ দেখল কয়েকটা মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে, জেটির একদম পাশ দিয়েই। গন্ধ পেল ফাহিমরা ।

জেটি থেকে নেমে গেল ওরা। দেখবে না ওরা এ নৌকা বাইচ। একদিকে লাশ ভেসে যাচ্ছে, অন্য দিকে লোক দেখানো আনন্দ উৎসব। এর অংশীদার হওয়াও পাপ। চলে গেল ওরা সদর রোডে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ভবনে উড়ছে পাকিস্তানের পতাকা।

হঠাৎ দুটি মিলিটারির গাড়ি দেখল ওরা। সামনের গাড়ির উপরে একটি মেশিনগান জাতীয় অস্ত্র রাখা। রাস্তার দিকে তাক করা। দ্বিতীয় গাড়ির মেঝেতে বেশ কয়েক জন, বসা আর আধশোয়া। পেছনে হাত মোড়া করে বাঁধা। মাথায়-গায়ে জখমের দাগ। একজনের কপালে রক্তের দাগ। চোখ ফুলে গেছে একজনের ।

বিকালে ফাহিমরা স্বপনদার বাসার দিকে গেল। ঠাকুরমাকে দেখা হয় না অনেক দিন। ঠাকুর মা সুস্থ আছেন। দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছেন ঘরময়। ওদের দেখে পাশের বাসা থেকে আসল শিরিন। জিজ্ঞেস করল, কই ব্যাপার ? অনেকদিন পর যে। এদিকে আসো না আর। কেন ?

ওরা কিছুই বলতে পারলো না। আসলেই তো, কি বলবে। অনেক দিন আসা হয়নি। আসা উচিত ছিল।

-আপা সব খবর ভালো তো ?

-হ্যাঁ ভালো । তবে গতকাল রাজাকাররা এসেছিল এদিকে। ছয় জনের একটি দল।

-কী করলো ওরা ?

-স্বপনদাদের বাসায় ঢুকল। সব কিছু দেখল খুটে খুটে। ওদের লক্ষণ ভাল মনে হল না।

-আপনার সাথে ওদের দেখা হয়েছে?

-না। তবে আমাদের বাসার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। আমি ভয়ে ঘর থেকে বের হইনি।

-কাউকে চিনতে পেরেছেন ?

-না। তবে দেখলে চিনতে পারবো। বলার মতো মনে করতে পারছি না। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছি তো। তবে হ্যাঁ। একটি লোককে মনে করতে পারছি। মোটা-সোটা। উপরের ঠোঁটটা কাটা।

-তাহলে তো মনে হচ্ছে, লক্ষণ কাকার বাসায় যারা থাকে, তারাই এসেছিল। ওদের একজনের ঠোট কাটা আছে। বলল ফাহিম।

-তোমরা মাঝে মাঝে এদিকে আসবে, কেমন ?

-ঠিক আছে আপা।

স্বপনদাদের বাসা থেকে বের হল ওরা। সেই অবাঙালি ছেলেগুলোকে আজও দেখা গেল গলিতে। খোকনদের দেখে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লাগলো । উর্দুতে। সিগারেট খাচ্ছে কায়দা করে। গাজাও হতে পারে। কারণ, ওদের চোখ লাল। ওদের দেখে রাগে গা ফুঁসছে ফাহিমদের। কে জানে। আজ আবার কিছু ঘটতে যাচ্ছে কি না। আচ্ছা, ফাহিমদের কি কিছু করার আছে?

দুই ঘণ্টা পরের কথা। রাজার মাঠের উল্টা দিকে ছুড়ুদের বাসা। বাসায় কেউ নাই। বাসার পেছনে ফাহিমরা পাঁচ জন দাঁড়িয়ে। ফাহিম, খোকন, মিল্টন, মনা ও পুনা। ওদের প্রত্যেকের কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগ ভর্তি পাথর। পাথরগুলো সংগ্রহ করেছে বি এম স্কুলের মাঠের সামনে থেকে। বিভিন্ন সাইজের পাথর। হয়তো ভবন নির্মাণের জন্য রাখা ।

মাগরিবের আযান শেষ হয়েছে কিছু আগে। রাস্তাটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তায় অবাঙালি সেই ছেলেগুলো হাঁটছে । তিনজন ওরা । যাচ্ছে কালীবাড়ির দিকে। বিশ-গজের মতো দূরে ছেলেগুলো।

হঠাৎ করে ফাহিমরা শুরু করলো পাথর ছোঁড়া। মুখে বলতে লাগলো, ‘এই তোরা দৌড়াবি না।

দৌড়াবি না বলছি। আজ তোদের একদিন কি আমাদের একদিন’। অবাঙালি ছেলেগুলো দৌড়াতে শুরু করলো। কষা দৌড়, এক দৌড়ে ওরা কালি বাড়ি রোডে এসে পৌঁছল । এরপর উধাও।

এদিকে ফাহিমরা ওদের পিছন পিছন গলির মাথা পর্যন্ত আসল। তারপর আর সামনে গেল না। ছেলে গুলোর কেউ আহত হয়েছে কি না বোঝা গেল না। ফাহিমরা পাথর ছুড়েছে রাস্তায়। গায়ে না। তবে সামনা-সামনা অবস্থা হলে অবশ্যই গায়ে ছুড়তে হত।

বদগুলোকে শায়েস্তা করতে পেরে খুব ভাল লাগছিল ফাহিমদের।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক